জোছনাফুল

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

জোছনাফুল

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : নাঈমা তামান্না
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ২৫০
পেপারব্যাক মূল্য : ২২৫

ISBN: 978-984-8254-71-4

Josnafool by Abdullah Mahmud Nazib, Published by
Guardian Publications, Price TK. 250 (HC)/TK. 225 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

জোছনার সঙ্গে প্রেম নেই– এমন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জোছনার কোমল আলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছে কত শত গল্প-কবিতা-প্রেমসুর; আসর জমানো গীত-সংগীত। কোনো কোনো কবির প্রতিভার প্রহর যেন শুরুই হয়েছে জোছনারাতে। কারণ, এই রাতেই ফুল ফোটে গদ্যে-পদ্যে এবং হৃদয়পটের না-বলা কথাগুলোর। মেলা বসে কল্পলোকের দোলায় দুলতে থাকা বনি আদমের।

'জোছনাফুল' বইটি ঠিক এমনই কথামালার ঝুড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে; জোছনার কুশুম-শীতল আলোয় ঝরে পড়েছে নানা রকমের বাক-চিত। বইটির মাধ্যমে পাঠককুল জোছনাস্নাত রাতের নীরবতায় শব্দস্নাত হয়ে হারিয়ে যাবে গভীর স্বপ্নলোকে; সেই স্বপ্নে থাকবে না কোনো কৃতিমতা, থাকবে না কোনো আনুষ্ঠানিকতা; রবে সুপেও-সুমধুর প্রাপ্তির সমাহার।

তরুণ প্রজন্মে কবি আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব ভাইয়ের লেখ্য-বচন নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তার তুলনা তিনি নিজেই। গার্ডিয়ান পাবলিকেন্স-এ তিনি ভরসা রেখেছেন– এতেই গার্ডিয়ান পরিবার তৃপ্ত। তার জন্য জোছনা-উজাড় ভালোবাসা।

পাশাপাশি অকৃতিম ভালোবাসা প্রকাশ করছি গার্ডিয়ান টিমের প্রতি; যারা একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের নেশায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের সকল কর্ম তৎপরতা কবুল করুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

প্রবেশক

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من والاه، وبعد..

'চান্নিপসর রাইতে' দাদুভাইয়ের কাছে গল্প শুনতাম ছোটোবেলায়। জোছনারাতে বসে আড্ডা জমানো আর গল্প বলার রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। পৃথিবীর যেকোনো ভাষার কথাসাহিত্যের ইতিহাস লেখতে গেলে চাঁদনী রাতে গোল হয়ে বসে শ্রুতকাহিনি শোনানোর ঐতিহ্যটা সর্বাগ্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে। এই বইটিকে ধরে নিন জোছনা রাতের আড্ডা। পাঠকরা সবাই গোল হয়ে বসে লেখকের কাছে কিছু গল্প শুনছেন। তবে লোককাহিনি নয়, রূপকথার কল্পগল্পও নয়; জীবনের পাঠশালায় শেখা ছোটো-বড়ো কিছু অনুভূতির আলেখ্য।

ক্যাম্পাসের কয়েকজন বন্ধু নিয়মিত এমন আড্ডা জমিয়ে বসে। বিশ্বাসী তরুণ তারা, ভালোবাসে কবিতাও। সেই আসরে আমারও ডাক পড়ে। বিশ্বাসের কথা বলি, কবিতার গল্প শোনাই, জীবন-ভাবনার আদান-প্রদান করি। একদিন ইচ্ছে হলো– জোছনারাতে সবাই মিলে নদীতে ভাসব; যেই কথা সেই কাজ, শুক্লপক্ষের রাতে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। লঞ্চের ছাদে গোল হয়ে বসে চাঁদের সাথে ভাব জমালাম, জোছনাধোয়া নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের বুকে। জোছনার চাদর গায়ে জড়িয়ে যে গল্প তাদের শুনিয়েছি, অনুভূতির যে স্কেচ তাদের সামনে এঁকেছি, প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টাকে অনুভব করার যে দর্শন খুঁজে বেড়িয়েছি– তারই লিখিত রূপ আজকের *জোছনাফুল*। চাঁদ আর জোছনা নিয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ মনে হলো– সূর্য যদি অভিমান করে বসে? তাকে নিয়েও একটা আসর বসানো যায়! ব্যস, পরবর্তী আড্ডা হয়ে গেল তাকে নিয়ে। সেই আড্ডা এই বইয়ে সংস্থিত হলো 'সূর্যশৌর্য' শিরোনাম নিয়ে। নদীতে ভেসে *জোছনাফুল* লিখলাম, সাগরে ভেসেও তো কিছু লেখা চাই! সমুদ্রবিহারের ডাক এলো একদিন। সফরটা যাতে সত্যিকারার্থেই 'শিক্ষাসফর' হয়, সমুদ্রের নীল রং দিয়ে ভাবনার পোর্ট্রেইট অঙ্কনের একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই ঝিলমিল নীল এই বইয়ে দেখা যাবে 'নীলমিল' শিরোনামে।

বইয়ের সবগুলো লেখাই এমনতরো আকস্মিক ভাবনার প্রসারিত রূপ, খামখেয়ালির প্রবর্তন। বিশ্বাসী মানুষ তাদের খামখেয়ালিকেও বিশ্বাসের দর্পণেই দেখে। দর্পণটা চিনিয়ে দেওয়ার বিনীত প্রয়াস আজকের বই।

ইতঃপূর্বে এই ধারায় আরও দুটি বই– *শেষরাত্রির গল্পগুলো* ও *তারাফুল*– লেখা হয়েছিল। কিছু পাঠক প্রশ্ন রেখেছেন– একই বইয়ে বিভিন্ন আকারের লেখা মলাটবদ্ধ হওয়া মানানসই কি না।

মানানসই কি না জানি না, তবে আমার কাছে চলনসই। কবিতা যখন লিখি, কখনো দুই পঙ্‌ক্তিতেই কথা শেষ হয়ে যায়। আবার কয়েকটা কবিতা দুশো লাইনেও শেষ করতে পারিনি। একই কাব্যগ্রন্থে চার লাইনের কবিতা, চোদ্দো লাইনের সনেট, শত লাইনের গল্পকাব্য যেভাবে পাশাপাশি নির্ঝঞ্ঝাট সংসার পাতে, গদ্যগ্রন্থেও একইভাবে ছোটো-মাঝারি-বড়ো আকারের লেখা একসাথে সংস্থিত করে রাখি। আমি 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল', সেই কথা কখনো এক পাতায় ফুরিয়ে যায়, কখনও দশ পাতাও লেগে যায়। কলমের সাথে জোরাজুরি করি না; যেখানে সে থামতে চায়, থামিয়ে দিই, যত দূর চলতে চায়, চালিয়ে নিই। ফলে নানাবিধ দৈর্ঘ্যের লেখা এক মলাটে জায়গা পায়।

গল্পগুলো যেহেতু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত ও সিঞ্চিত, ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসের একটা প্রভাব এতে আছে। হৃদয়ের খোরাক পেতে কুরআন পড়ি, পথচলার জ্বালানি সঞ্চয় করি হাদিসের পাতা থেকে, আনন্দ খুঁজে বেড়াই বিশ্বসাহিত্যের নানা অলি-গলি ঘুরে। এই ত্রিমোহনী হাটে যা কিছু কুড়িয়ে পাই, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ও সামষ্টিক আড্ডায় সে সবকিছু বিলিয়ে বেড়াই। নিজে যেসব ভুল করেছি, সেই ভুল থেকে উঠে আসার জার্নিটা শেয়ার করি। পরিবার, শিক্ষায়তন, সাথি-সতীর্থ– যেখানে যা কিছু শিখি, সবকিছু লিখে রাখতে চাই। *জোছনাফুল*-এর লেখাগুলো এর ব্যতিক্রম নয়। এসবের পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে নবিজি ﷺ-এর একটা হাদিস : 'মানুষকে যে ভালো কথা বা ভালো কাজ শেখায়, তার ওপর আল্লাহ রহম করেন, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, আসমান ও জমিনের সব সৃষ্টি– এমনকী গর্তের পিঁপড়া আর সাগরের মাছও তার জন্য দুআ করে।'[১]

আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, ফেরেশতাদের ইস্তিগফারের আকাঙ্ক্ষী, মানুষ ও সৃষ্ট জীবের দুআ পেতে আকুল। এ জন্য নিজের অসংখ্য অসংগতি ও পাপ সত্ত্বেও কাউকে ভালো কিছু জানানো ও শেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। প্রবন্ধগল্প ধাঁচের বইগুলো সম্ভবত সেই আকাঙ্ক্ষারই ফসল।

এখানকার বেশ কিছু লেখা ইতঃপূর্বে ব্লগে ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন-সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আমার অসুখ, ইবন তাইমিয়ার প্রেসক্রিপশন' শিরোনামের একটি লেখা পাঠকদের কাছে আদৃত হতে দেখেছি। শিরোনামটি বইয়ে খুঁজে না পেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ওটা মূলত 'বাইশ জানুয়ারি' শীর্ষক লেখাটিরই একটি অংশ। সম্পাদকদের অনুরোধে নতুন লেখা তৈরি করার সুযোগ পাইনি বিধায় অংশবিশেষ আলাদা শিরোনামের অধীনে সাময়িকীগুলোতে দিয়েছিলাম।

---

১. সুনানে তিরমিজি : ২৬৮৫

বইয়ের শেষদিকে একটা কবিতা যুক্ত করেছি। বইয়ের অধিকাংশ লেখার ধাঁচের সাথে কবিতাটা প্রাসঙ্গিক মনে হলো, তাই কাব্যের পাণ্ডুলিপি থেকে তাকে এখানে স্থানান্তর করেছি। প্রবন্ধগল্পের বইয়ে পুরোদস্তুর কবিতা তুলে দেওয়া ঠিক হলো কি না, কী জানি! তবে গদ্যের বই হওয়াতে গদ্য-কবিতা একেবারে হয়তো বেমানান হবে না।

প্রিয় পাঠক, আপনার দুআয় লেখককে স্মরণ রাখবেন, ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অবহিত করবেন।

আপনার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ুক অযুত জোছনাফুলের সৌরভ।

الفقير إلى عفو ربه
আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব
জানুয়ারি ২৭, ২০২০ ঈসাব্দ
পদ্মা-২০০৫, বিজয় একাত্তর হল, ঢাবি
amnazib.1997@gmail.com

সূচিপত্র

মেনে নেব আমার এ ঈদ	১৩
আয়না ভাঙার ডাক	১৬
আল মুকাদ্দিমা : অন্যপাঠ	২৫
মিশন জিন্নুরাইন	২৭
এক ফোঁটা আবেহায়াত	৩৭
শেকড় ভোলার দায়	৩৮
বাইশ জানুয়ারি	৪১
ফ্রিল্যান্সিং	৬৫
সাশ্রু	৬৬
জোছনাফুল	৭০
সূর্যশৌর্য	৯২
নীলমিল	১১৯
কেন সাহিত্য পড়ি	১৩৩
তোমাকে ভালোবাসি কেন	১৩৭
গ্রন্থপঞ্জি	১৪০

মেনে নেব আমার এ ঈদ

ঢাকায় থিতু হওয়ার আগে কবি আল মাহমুদকে আমি চাচা ডাকতাম। ক্লাস সেভেনে অধ্যয়নের সময় আব্বু কিনে দিয়েছিলেন আল মাহমুদের দুটো বই *পাখির কাছে ফুলের কাছে* এবং *মরু মুষিকের উপত্যকা*। এ দুটো পড়ার পর তাঁকে 'প্রিয় আল মাহমুদ চাচা' বলে সম্বোধন করে একটা পত্র লিখেছিলাম। কবির বাসার ঠিকানা জানতাম না। বইয়ে সংস্থিত প্রকাশকের ঠিকানায় পত্র পাঠিয়েছিলাম। কতদিন অপেক্ষায় ছিলাম, পত্রের জবাব আসবে! আসেনি। মন খারাপ করছি দেখে আব্বু যথারীতি সান্ত্বনা দিলেন। চিঠিটা হয়তো পৌঁছেনি অথবা পৌঁছলেও প্রকাশক এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। ফলে কবির কাছে 'ফরোয়ার্ড' করেননি বা করতে চেয়ে পরে ভুলে গিয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে, কবির হাতেও পৌঁছেছে, কিন্তু উত্তর লেখার সময় পাননি।

এত 'ইহতিমাল' শোনার পর দুঃখ জমিয়ে রাখা দায়। অনেকবার ভেবেছিলাম, কবির সাথে সাক্ষাৎ হলেই জিজ্ঞাসা করব– এমন একটা চিঠি আপনি পেয়েছিলেন কি না? কিন্তু সাহস হয়নি। ঢাকায় আসার পর সম্বোধনের ধরন পরিবর্তন করে 'দাদা' ডাকতে ইচ্ছে হলো। প্রথমত তিনি আমার দাদার প্রায় সমবয়সি, দ্বিতীয়ত দুজনের নামের মিল। আমার দাদার নাম আবদুশ শাকুর। আল মাহমুদের পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুশ শুকুর। কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে দাদা ডাকার সাহসও হয়নি। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৭-তে। আমার বেশ কিছু অণুকাব্য নিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি হলো। এই পাণ্ডুলিপি ছাপার অক্ষরে মলাটবদ্ধ করব কি করব না– সিদ্ধান্তহীনতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছিলাম। একবার ভাবলাম, আল মাহমুদ দাদাকে পড়ে শোনাব। তিনি হ্যাঁ বললে সামনে এগোবো।

অগ্রজপ্রতিম শিল্পী তাওহীদুল ইসলাম ভাইয়ার সাথে হাজির হলাম মগবাজারস্থ কবির বাসায়। তাঁর জন্য বিস্কুট আর হরলিক্স নিয়ে এসেছি দেখে মুচকি হাসলেন। তাওহীদ ভাইয়া অনেকগুলো কবিতা পড়ে শোনালেন। আল মাহমুদ তখন চোখে কম দেখেন, কানেও খুব ভালো শুনতে পান না। অনেক বড়ো করে বললে শোনেন। কয়েকটা অণুকাব্য শোনার পর অনুচ্চ স্বরে বললেন– 'এই কবিটা আবেগে ভাসছে।' আর কয়েকটা শোনার পর বললেন– 'কবিতা আবেগে থরথর করে কাঁপছে।' কাঁপা কাঁপা হাতটা নাড়িয়ে ধীরলয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। ইতিবাচক সাড়া পেয়ে আমি স্বস্তি পেলাম।

তাওহীদ ভাইয়া অনুরোধ করলেন একটা ছোটো ভূমিকা দেওয়ার জন্য। কবি বললেন। ভাইয়া অনুলিখন করলেন। এই ছোটো লেখাটা আমার জীবনের সেরা পাওয়া। এই একটা ভূমিকা নিছক কিছু শব্দের সমাবেশ নয়, এ আমার গর্বের ধন। শৈশব থেকে দীর্ঘকাল আল মাহমুদ আমার আবেগের জায়গা ছিলেন। ডায়েরিতে চুপিসারে অনেকবার নিজের নাম লিখেছি এভাবে– আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ নজীব। *সৌরভের কাছে পরাজিত* গল্পগ্রন্থের পাতায় যে অশ্রু আমি ফেলেছি, *বখতিয়ারের ঘোড়া* কাব্যগ্রন্থের সাথে যে ভাষায় আমি কথা বলেছি, তাকে তরজমা করার সাধ্য পৃথিবীর নেই। *যে পারো ভুলিয়ে দাও* উপন্যাসের সাথে যে আবেগ আমি মিশিয়ে রেখেছি, কেউ পারবে তা ভুলিয়ে দিতে? আল মাহমুদের জানাজায় জায়গা পেয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ বারান্দায়। আধা-নিস্তেজ সূর্যোত্তাপের নিচে দাঁড়িয়ে সামনে যে আদিগন্ত আকাশ দেখেছি, আমার হৃদয়ে অনুভূত শূন্যতা কি তারচেয়ে বেশি ছিল না?

তাঁর মৃত্যুর পর একটা কবিতা সবার মুখে মুখে খুব ছড়িয়েছিল–

‘কোনো এক ভোরবেলা রাত্রি শেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাগিদ
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের অন্ধকারে
ভালো মন্দ যা ঘটুক মেনে নেব এ আমার ঈদ।’

আল মাহমুদের মৃত্যুর পর প্রায় সবাই লিখেছেন, কবি সত্যিই শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখানে সামান্য ভুল আছে। ইসলামি ঐতিহ্যে সন্ধ্যার পর নতুন দিন শুরু হয়ে যায়। এ জন্য দেখা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকেই শুক্রবারের সুন্নাত পালন শুরু হয়ে যায়। কবি মৃত্যুবরণ করেছেন শুক্রবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শনিবারে। মৃত্যুর দিনক্ষণ নিয়ে আমার কোনো মনোযোগ নেই। মৃত্যু যেদিনই হোক না কেন, ঈমান ও আমলে সালিহ নিয়ে যেতে পারলে আল্লাহর কাছে পুরস্কার, অন্যথা তিরস্কার। আল্লাহ যেন কবিকে পুরস্কারের উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করেন, আমরা এই দুআ করি।

আমার বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ ওপরের চারটি পঙ্‌ক্তির সর্বশেষটি নিয়ে। ‘মেনে নেব আমার এ ঈদ।’ ঈদ শব্দের সাথে আনন্দের দ্যোতনা আছে। মৃত্যু ও বিদায় সাধারণত হৃদয়বিদারণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি এটাকে ঈদ হিসেবে দেখছেন কেন? পরে ভাবলাম, দেখা তো যায়-ই। মৃত্যু মানে আরেক জীবনের উদ্বোধন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার সূচনা। তিনি বিশ্বাসী শিল্পী, অন্ধকার মাড়িয়ে এসে আলোর মিম্বরে দাঁড়ানো সাহসী দীপ্তবাক, আল্লাহর স্মরণ ও শরণে স্থিতধী মানুষ; নতুন জীবনটা তাঁর করুণার ছায়ায় আনন্দে কাটবে– এমন প্রত্যাশা ও স্বপ্ন লালন করাটা খুবই স্বাভাবিক।

এই ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আমার আলেকজান্দ্রিয়ান বন্ধু আমিরের একটা খুদে বার্তায়। ঈদ উপলক্ষ্যে সে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে–

اجعل حياتك رمضان، تجد آخرتك عيدا

‘যদি জীবনটা রমজানের মতো কাটাতে পারো, আখিরাতটা ঈদের মতো হবে।’

কী সাংঘাতিক কথা! কয়েক মাস আগে কথাটা তার মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু সেবার খুব একটা ভাবান্তর না হলেও এবার দেখি– কথাটা একেবারে কলিজায় গিয়ে লেগেছে। একমাস সিয়াম-সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে ঈদের চাঁদ আসে। আনন্দের দিনটা মূলত তাদের জন্য, যারা পুরো মাস নিয়মানুবর্তী ছিলেন, নিজেকে পরিশীলনের কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন। আল্লাহকে ভয় করে অনেক আনন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষেরাই পুরস্কার হিসেবে ঈদের আনন্দ উপহার পান। এই শুদ্ধাচারী মনন যদি সব সময় ধারণ করা যায়, পরিশুদ্ধি ও পরিশীলনের চর্চাটা যদি বাকি দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা যায়; এককথায় জীবনটা যদি রমজানের মতো আল্লাহমুখিতায় যাপন করা যায়, তাহলে জীবনের শেষে আরেকটা বড়ো ঈদ যে অপেক্ষা করছে, তা কি আর বলতে হয়! সেই ঈদটাকেই আমাদের চেনা-জানা পরিভাষায় আখিরাত বলে থাকি। সেই জীবনটা যেন সত্যিই ঈদের মতো হয়, আনন্দোদ্বেল ও প্রশান্তির হয়, স্বপ্ন দেখব। সেই ঈদটা মাটি হয়ে যায়, এমন কিছু যেন না করে ফেলি, সতর্ক থাকব। ভুলবশত যখন করে ফেলি, আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেব।

পশ্চিমাকাশে চাঁদ হাসলেই পৃথিবীতে ঈদ চলে আসে।

আল্লাহ! এমন একটা জীবন দাও, যেন চোখের পাতা বন্ধ হলেই স্বপ্নের ঈদটা পেয়ে যাই।